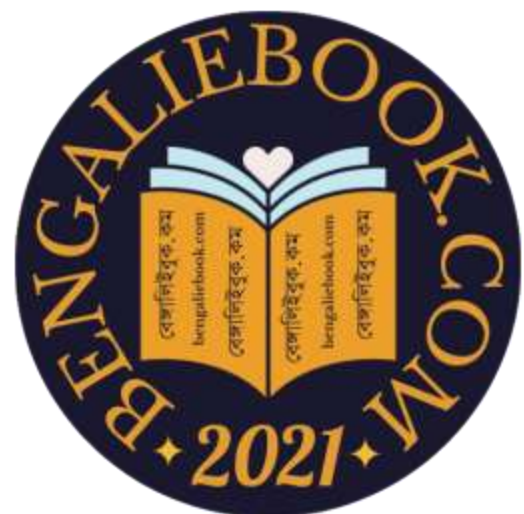


প্রবন্ধ

বগম

বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



কাম*

হিন্দুধর্মগ্রন্থসকলে “কাম” শব্দটি সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কামাত্মা বা কামার্থী, তাহার পুনঃ পুনঃ নিন্দা আছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক এই “কাম” শব্দের অর্থ বুঝিতে বড় গোল করেন, এই জন্য সকল স্থানে তাঁহারা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা সচরাচর ইন্দ্রিয়বিশেষের পরিতৃপ্তির ইচ্ছার্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং শাস্ত্রেও ঐ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই তাঁহারা বুঝেন। সেটা ভ্রান্তি। মহাভারত হইতে দুই একটা কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা কাম শব্দের অর্থ বুঝাইতেছি।

“পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ করে, তাহারই নাম কাম।” (বনপর্ব, ৩৩ অধ্যায়)। ইহা একেবারে নিন্দনীয় বিষয় বলিয়া স্থির হইতেছে না। “মন ও হৃদয়” এই কথা না বলিয়া কেবল যদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হইত, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, ইন্দ্রিয়বশ্যতা (Sensuality) এই দুস্প্রবৃত্তিই নাম কাম। কিন্তু “মন” ও “হৃদয়” থাকাতে সে কথা খাটিতেছে না। জ্ঞানান্তরে বলা হইতেছে যে, “স্রচ্চন্দনাদিরূপ দ্রব্য স্পর্শ বা স্বর্ণাদিরূপ অর্থ লাভ হইলে মনুষ্যের যে প্রীতি জন্মে তাহারই নাম কাম।”

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ উহা কোন প্রকার প্রবৃত্তি বা বৃত্তি নহে; প্রবৃত্তি বা বৃত্তির পরিতৃপ্তাবস্থা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, উহা সকল সময়ে নিন্দনীয় বা জঘন্য সুখ নহে। উহা সদসৎ কর্মের ফল। এই জন্য পশ্চাৎ কথিত হইতেছে যে, “উহা কর্মের এক উৎকৃষ্ট ফল। মনুষ্য এইরূপে ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনের উপর পৃথক পৃথক রূপে দৃষ্টিপাতপূর্বক কেবল ধর্মপর বা কামপর হইবে না। সতত সম-ভাবে এই

ত্রিবার্গের অনুশীলন করিবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পূর্বাহ্নে ধর্মানুষ্ঠান, মধ্যাহ্নে অর্থচিন্তা ও অপরাহ্নে কামানুশীলন করিবে। ”

“কেবল ধর্মপর হইবে না।” এমন একটা কথা শুনিলে হঠাৎ মনে হয়, যে ব্যক্তি এ উপদেশ দিতেছে, সে ব্যক্তি হয় ঘোরতর অধার্মিক, নয় সে ধর্ম শব্দ কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছে। এখানে দুই কথাই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্য। এখানে বক্তা খোদ ভীমসেন; তিনি অধার্মিক নহেন, কিন্তু তিনি যুধিষ্ঠির বা অর্জুনের ন্যায় ধর্মের সর্বোচ্চ সোপানে উঠেন নাই। এবং ধর্ম শব্দও তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার একটা কথাতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি পরে বলিতেছেন, “দান, যজ্ঞ, সাধুগণের পূজা, বেদাধ্যয়ন ও আর্জ্জব, এই কয়েকটি প্রধান ধর্ম। ”

বস্তুতঃ আমরা এখন যাহাকে ধর্ম বলি, তাহা দ্বিবিধ; এক আত্ম-সম্বন্ধী, আর এক পরসম্বন্ধী। পরসম্বন্ধী ধর্মই ধর্মের প্রধান অংশ; কিন্তু আত্মসম্বন্ধী ধর্মও আছে, এবং তাহা একেবারে পরিহার্য্য নয়। আমি পরকে সুখে রাখিয়া যদি আপনিও সুখে থাকিতে পারি, তবে তাহা না করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক কষ্ট সহিব কেন? ইচ্ছাপূর্ব্বক নিষ্ফল কষ্ট পাওয়া অধর্ম। এখানে ভীমসেন সেই পর-সম্বন্ধী ধর্মকেই ধর্ম বলিতেছেন, এবং আত্ম-সম্বন্ধী ধর্মের ফলভোগকে কাম বলিতেছেন। তাহা বুঝিলে, “কেবল ধর্মপর হইবে না” এ কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতঃ ধর্মকে আত্মসম্বন্ধী, এবং পরসম্বন্ধী, এরূপ বিভাগ করা উচিত নহে। ধর্ম এক; ধর্ম মাত্র আত্মসম্বন্ধী ও পরসম্বন্ধী। অনেকে বলেন যে, ধর্ম কেবল পরসম্বন্ধী হওয়াই উচিত। আবার অনেকে বলেন, যথা খ্রীষ্টীয়ানেরা, যে যাহাতে আমি পরকালে সদাতি লাভ করিব, তাহাই ধর্ম। অর্থাৎ তাহাদের মত, ধর্ম কেবল আত্মসম্বন্ধী।

স্থূলকথা, ধর্ম আত্মসম্বন্ধীও নহে, পরসম্বন্ধীও নহে। সমস্ত বৃত্তিগুলির উচিত অনুশীলন ও পরিণতিই ধর্ম। তাহা আপনার জন্যও করিবে না, পরের জন্যও করিবে না। ধর্ম বলিয়াই করিবে। সেই বৃত্তিগুলি নিজ-সম্বন্ধিনী, ও পর-সম্বন্ধিনী; তাহার অনুশীলনে স্বার্থ ও পরার্থ একত্রে সিদ্ধ হয়। ফলতঃ ধর্ম এই ভাবে বুঝিলে স্বার্থে এবং পরার্থে প্রভেদ

উঠাইয়া দেওয়া অনুশীলনবাদের একটি উদ্দেশ্য। “ধর্মতত্ত্বে” এই অনুশীলনবাদ বুঝান
গিয়াছে।

*প্রচার, ১২৯২, আষাঢ়।
